HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৫ • সংখ্যা ৪ • ডিসেম্বর ২০০৭
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

কালাজ্বর পরবর্তী ডারমাল লেশমেনিয়াসিস (পিকেডিএল): নতুন করে পর্যবেক্ষণ পূর্ববর্তী ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে

পৃষ্ঠা ১৩

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার সাথে বাল্য-বিয়ের সম্পর্ক

পৃষ্ঠা ১৮

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

২০০৭ সালে বাংলাদেশে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ

২০০৭ সালে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দু'টি ভিন্ন এলাকায় নিপা ভাইরাসের ফলে এনসেফালাইটিস-এর দু'টি প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। প্রত্যেকটি প্রাদুর্ভাবই তিন সপ্তাহের কম সময় স্থায়ী ছিলো এবং মৃতের হার ছিলো অনেক বেশি (৪৩%-৬৩%)। দু'টি প্রাদুর্ভাবেই রোগীরা একই সময়ে ও স্থানে আক্রান্ত হয়েছিলো এবং প্রথম রোগীর আক্রান্ত হওয়ার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকিরা আক্রান্ত হওয়ার ফলে বোঝা যায় যে, ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে নিপা সংক্রামিত হয়েছিলো। ভাইরাসটি যেহেতু ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রামিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে, সেহেতু বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এর সংক্রমণ প্রতিরোধ-সংক্রান্ত বাড়তি উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনও বেড়ে গেছে।

২০০১-২০০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে পাঁচটি নিপা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সনাক্ত করা গেছে এবং সবক'টিই সংঘটিত হয়েছে জানুয়ারি-মে মাসের মধ্যে দেশের উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলে (১-৪) (চিত্র ১)। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আইসিডিডিআর,বি-র সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ-নির্ণয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট অব ইপিডেমিওলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ [আইইডিসিআর]) যেসব এলাকায় বারবার নিপা প্রাদুর্ভাব ঘটছে সেসব এলাকার ১০টি হাসপাতাল নিয়ে একটি

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

চিত্র ১: ২০০১-২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত নিপা প্রাদুর্ভাবের স্থানসমূহ

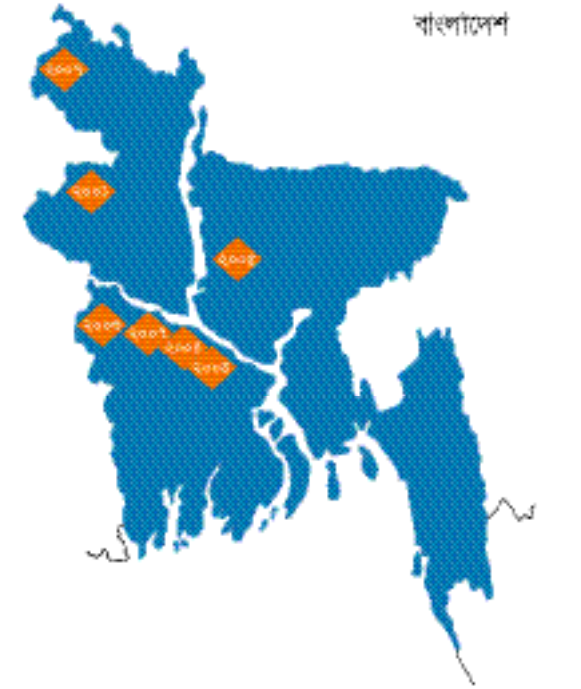

সার্ভিলেন্স এলাকা গঠন করেছে।

২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে দু'টি প্রাদুর্ভাবের খবর আসে আইইডিসিআর-এ। দু'টি প্রাদুর্ভাবই প্রথমে জ্বর দিয়ে শুরু হয় এবং পরে মারাত্মক এনসেফালাইটিস-এ গিয়ে গড়ায়। প্রথম প্রাদুর্ভাবটির কথা জানা যায় ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত নিপা সার্ভিলেন্সের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে। ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলায় বসবাসকারী ২৫ বছর-বয়সী এক মহিলা চিকিৎসককর্তৃক নির্ণীত এনসেফালাইটিস রোগ নিয়ে ওই হাসপাতালে ভর্তি হন। ৪ ফেব্রুয়ারি প্রথমে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর শুরু হয় তাঁর মাথাব্যাথা, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি এবং জ্ঞান হারানো। পরবর্তীতে ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। নিহতের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাঁর স্বামীও একই ধরনের অসুস্থতায় এর আগের সপ্তাহে মারা গেছেন। ২০০৭ সালের ৯ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থপনা কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবটি সম্পর্কে জানান। তিনি এ-খবরটি জানানোর অব্যবহিত পূর্বে সদর উপজেলায় ইতোপূর্বে সুস্থ থাকা পাঁচজন মানুষ মারা গেছে। দু'টি প্রাদুর্ভাবের ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর পরই আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি-র কর্মচারীদের সমন্বয়ে তাৎক্ষণিকভাবে একটি দল গঠন করে ঘটনা অনুসন্ধান করা হয়েছে। দলটি প্রাদুর্ভাব-কবলিত গ্রামসমূহের সেসব অসুস্থ মানুষের অসুস্থতার ইতিহাস সংগ্রহ করে, যাদের অসুস্থতা সন্দেহভাজন রোগের লক্ষণসমূহ অর্থাৎ অসুস্থতা, মাথাব্যাথা বা কাশির সাথে মিলে যায়। সন্দেহভাজন জীবিত রোগীদের কাছ থেকেও রক্ত এবং থ্রোট সোয়াব সংগ্রহ করা হয়।

যেসব রোগীর সিরামে নিপা ভাইরাসের আইজিএম অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়, অনুসন্ধান কমিটি তাদের নিপা রোগী বলে নিশ্চিত করেছে এবং যেসব রোগীর মধ্যে নিপার মতো একই ধরনের লক্ষণ দেখা গেছে এবং একই এলাকায় বাস করতো তবে মারা যাওয়ার ফলে তাদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা যায় নি, তাদেরকে সম্ভাব্য নিপা রোগী হিসেবে বর্ণনা করেছে। ঠাকুরগাঁও থেকে মোট সাতটি (পাঁচটি নিশ্চিত এবং দু'টি সম্ভাব্য) এবং কুষ্টিয়া থেকে আটটি (তিনটি নিশ্চিত এবং পাঁচটি সম্ভাব্য) নিপা রোগী সনাক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি রোগীর ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমিটি একই

প্রতিবেশী এলাকা থেকে তিনজন মানুষকে কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) হিসেবে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রেখেছে এবং নিপা সংক্রমণের ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করার জন্য নিপা রোগী এবং নিয়ন্ত্রিত মানুষদের (কন্ট্রোলদের) কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে।

ঠাকুরগাঁয়ে প্রথম ব্যক্তিটি অসুস্থ হয় ২০০৭ সালের ২১ জানুয়ারি। এর পর পর ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আরো ছয়জন অসুস্থ হয়ে পড়ে (চিত্র ২)। জ্বর শুরু হওয়ার দিন থেকে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত অসুস্থতার মধ্যম পর্যায়ের মেয়াদকাল ছিলো পাঁচ থেকে ছয়দিন (রেঞ্জ=পাঁচ থেকে সাতদিন)। কুষ্টিয়া-প্রাদুর্ভাবে প্রথম অসুস্থ হওয়ার ঘটনাটি ঘটে ১৭ মার্চ এবং এরপর ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত সাতজন অসুস্থ হয়ে পড়ে (চিত্র ৩)। প্রথম অসুস্থ হওয়ার দিন থেকে রোগীদের মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত মধ্যম পর্যায়ের (মেডিয়ান) মেয়াদকাল ছিলো চার দিন। উভয় প্রাদুর্ভাবেই রোগীরা কাছাকাছি স্থানের বাসিন্দা ছিলো এবং তাদের অসুস্থ হওয়ার সময়ও ছিলো কাছাকাছি, এবং তারা প্রত্যেকেই হয় প্রথম রোগীর আত্মীয় অথবা একই বন্ধু সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

চিত্র ২: ঠাকুরগাঁয়ে নিপা রোগীদের অসুস্থতা শুরু হওয়ার তারিখসমূহ

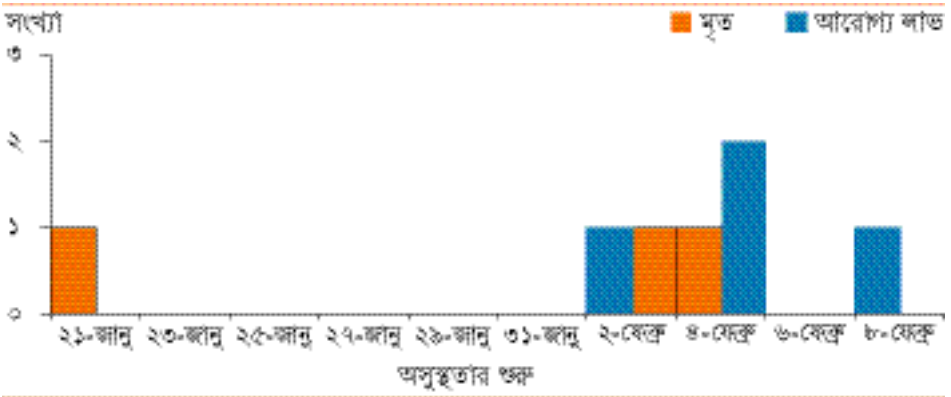

চিত্র ৩: কুষ্টিয়ায় নিপা রোগীদের অসুস্থতা শুরু হওয়ার তারিখসমূহ

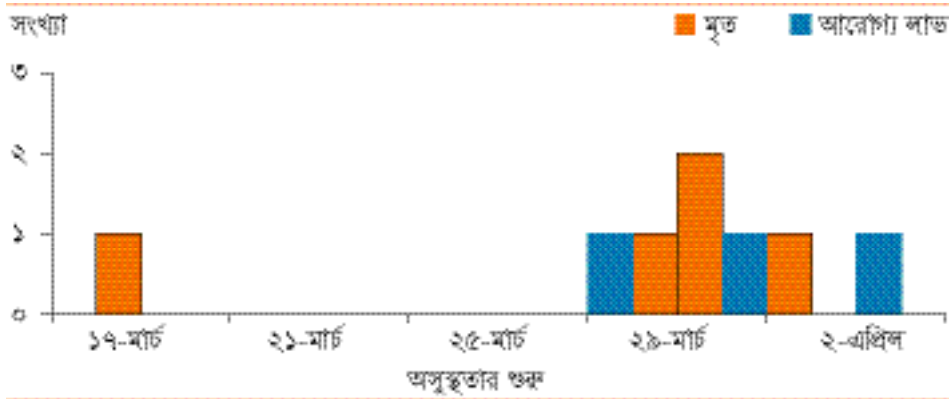

রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণসমূহ (সারণি ১) ছিলো কাশি এবং মারাত্মক দুর্বলতাসহ জ্বর, মাথাব্যাথা এবং চেতনার পরিবর্তন। ঠাকুরগাঁয়ের প্রাদুর্ভাবে দেখা গেছে নিয়ন্ত্রিতদের তুলনায় নিপা রোগীদের অন্য একজন নিপা রোগীর সাথে একই কক্ষে বসবাস করার সম্ভাবনা ছিলো বেশি (৮৬% বনাম ৯.৫%)। কুষ্টিয়ার নিপা রোগীদেরকে নিয়ন্ত্রিতদের সাথে তুলনা করে দেখা গেছে যে, তাদের অসুস্থ কাউকে স্পর্শ করার সম্ভাবনা ছিলো বেশি (৫০% বনাম ০%)।

সারণি ১: প্রাদুর্ভাবভিত্তিক নিপা রোগীদের সামাজিক, জনমিতিক এবং ক্লিনিক্যাল তথ্যাবলি

বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঠাকুরগাঁও (সংখ্যা=৭)	কুষ্টিয়া (সংখ্যা=৮)
বয়সের গড় (রেঞ্জ)	২৪ (১৯-৩০)	৩৫ (২৭-৫৫)
পুরুষের সংখ্যা (%)	৫ (৭১)	২ (২৫)
ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য: সংখ্যা (%)		
জ্বর	৭ (১০০)	৮ (১০০)
ভীষণ কর্মক্ষমতার অভাব/দুর্বলতা	৬ (৮৬)	৭ (৮৮)
মাথাব্যাথা	৩ (৪৩)	৬ (৭৫)
বমি	৫ (৭১)	৫ (৬৩)
কাশি	৫ (৭১)	৫ (৬৩)
শ্বাস-প্রশ্বাসে যন্ত্রণা	৪ (৫৭)	৫ (৬৩)
মানসিক অবস্থার পরিবর্তন	৫ (৭১)	৫ (৬৩)
মাংশপেশীতে ব্যাথা	৪ (৫৭)	৫ (৬৩)
অস্থিরতা	৪ (৫৭)	৪ (৫০)
অচেতন	২ (২৯)	৩ (৩৮)
অস্থিসন্ধিতে ব্যাথা	১ (১৪)	৩ (৩৮)
মৃতের সংখ্যা (%)	৩ (৪৩)	৫ (৬২)
রোগের শুরু থেকে মৃতু পর্যন্ত দিনের ব্যাপ্তি	৫-৭	১-৭

প্রতিবেদক: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন এবং হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, ইউএসএ এবং ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ ডিভিশন অব মাইক্রোবায়োলোজি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ, ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশনস ইন ইনফেকশাস ডিজিজ অপরচুনিটি পুল

মন্তব্য

এই প্রাদুর্ভাবগুলোর উভয়ই নিপা ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত হয়। পূর্ববর্তী প্রাদুর্ভাবের মতো এ-দু'টিতেও প্রাথমিকভাবে রোগের লক্ষণ ছিলো জ্বর, দুর্বলতা এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন (১,২)। এই প্রদুর্ভাবগুলোর ধরনও ছিলো পূর্ববর্তী নিপা প্রাদুর্ভাবসমূহের মতো যেখানে কতিপয় সুস্থ

মানুষ, যারা একে অপরের কাছাকাছি বসবাস করতো, হঠাৎ করে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ২০০১ সাল থেকে এ-পর্যন্ত বাংলাদেশে যতগুলো নিপা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয় সেগুলোর মধ্যে আলোচ্য দু'টি প্রাদুর্ভাব ছিলো যথাক্রমে ষষ্ঠ এবং সপ্তম প্রাদুর্ভাব।

উভয় প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রেই রোগীদের সংক্রমণের সূত্র সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা পাওয়া যায় নি। তবে প্রথম সংক্রমণের পরবর্তী সংক্রমণসমূহ ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে ছড়িয়েছে বলে বোঝা যায়। দ্বিতীয়বার সর্বোচ্চ-সংখ্যক রোগী আক্রান্ত হয় প্রথমজন আক্রান্ত হওয়ার ১২-১৩ দিন পর এবং এতে দেখা যায় যে, রোগীরা একই পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশি এবং সহকর্মী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। নিয়ন্ত্রিতদের তুলনায় পরবর্তী রোগীদের প্রথম রোগীর কাছ থেকে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিলো। বাংলাদেশে পূর্ববর্তী অনুসন্ধানগুলোতেও ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেছে (৩)।

বাংলাদেশের মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিপার ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, বিশেষ করে জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে। চিকিৎসকগণ যদি জ্বর এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তনসহ কোনো রোগী দেখেন, তাহলে তাঁদের অনুসন্ধান করা উচিত যে, ওই রোগী বা রোগীদের কাছাকাছি এলাকায় পূর্ববর্তী দু'সপ্তাহের মধ্যে একই ধরনের লক্ষণসম্বলিত কোনো রোগী ছিলো কি না। এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত কিছু রোগী একত্রিতভাবে কোথাও দেখা গেলে সাথে সাথে খবরটি জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।

বাংলাদেশে বারবার নিপা ভাইরাসের এই প্রাদুর্ভাব, যা ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রামিত হওয়ার ফলে সংঘটিত হচ্ছে, এমন কিছু কলা-কৌশল উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্বারোপ করছে যার মাধ্যমে বাড়ি এবং হাসপাতাল উভয় স্থানে রোগীর মুখের লালা থেকে ছড়ানো সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে। পূর্ববর্তী প্রাদুর্ভাবের সময় দেখা গেছে যে, নিপা রোগীর সংস্পর্শে আসার পর হাত ধোয়ার ফলে সংক্রমণ প্রতিহত হয়েছে (৫)। ভারতের শিলিগুড়িতে হাসপাতালে সঠিকভাবে নিপা রোগীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিকিৎসা দেওয়ার ফলে হাসপাতালের মধ্যে নিপা-সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে (৬)।

মারাত্মক অসুস্থ রোগীদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রোগটির সংক্রামিত হওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের কাছে সংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। হাত ধোয়া, রোগীর সাথে এক বিছানায় না শোয়া অথবা তার সাথে খাবার ভাগাভাগি করে না খাওয়া এবং রোগীর সংস্পর্শে খুব কম আসার মতো প্রতিরোধমূলক কিছু মূল কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তি-থেকে–ব্যক্তিতে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

কালাজ্বর পরবর্তী ডারমাল লেশমেনিয়াসিস (পিকেডিএল): নতুন করে পর্যবেক্ষণ পূর্ববর্তী ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে

কালাজ্বর-পরবর্তী ডারমাল লেশমেনিয়াসিস বা পিকেডিএল একটি ভিন্নধর্মী চর্মরোগ যা চিকিৎসা পেয়ে ভাল হয়ে যাওয়া কিছুসংখ্যক কালাজ্বর রোগীর মধ্যে সাধারণত তাদের রোগের সমস্ত উপসর্গ মিটে যাওয়ার পর শরীরের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন আকারে দেখা যায়। যদিও এটি কালাজ্বর-সংক্রমণ পরিক্রমার একটি সংকটপূর্ণ অবস্থা হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এবং সেরকমই মনে করা হয়ে থাকে, তথাপি এর রোগতাত্ত্বিক এবং ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এপর্যন্ত খুব কমই জানা গেছে। ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ায় বর্তমানে চালু একটি সার্ভিলেন্স কার্যক্রম থেকে পাওয়া প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় যে, সম্প্রতি চিকিৎসাপ্রাপ্ত কালাজ্বর রোগীদের মধ্যে পিকেডিএল-এর হার সর্বোচ্চ ১৮% পর্যন্ত এবং কালাজ্বর হিসেবে চিকিৎসা নেওয়ার দু'বছরের মধ্যেই অধিকাংশ পিকেডিএল রোগীর চামড়ায় ক্ষত ছিলো। এছাড়া সোডিয়াম অ্যান্টিমনি গ্লুকোনেট (এসএজি) ইনজেকশনের ছয়মাসের কোর্স সম্পন্ন করার আগেই অনেক পিকেডিএল রোগী ভাল হয়ে গিয়েছিলো। প্রাথমিক এ-পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পিকেডিএল রোগের হার, এর ধরন ও উপসর্গ এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তাসম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং এ-রোগের ওপর আরো গবেষণা ও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে চালু থাকা কার্যক্রমগুলো পুনর্বিবেচনার দাবী করে।

ভিসেরাল লেশমেনিয়াসিস, যা কালাজ্বর নামে বেশি পরিচিত, বেলেমাছি দ্বারা সংক্রামিত একটি পরজীবী রোগ, যার লক্ষণসমূহ হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে জ্বরে ভোগা, প্লীহা ফুলে যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য থাকা এবং ওজন কমে যাওয়া। কালাজ্বর দক্ষিণ-এশিয়ায় অনেক বেশি অবহেলিত একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ, যা ১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে আবার দেখা দেয় এবং বছরের সব সময়ই রোগটি ওইসব অঞ্চলে দেখা দিতে পারে (এনডেমিক)। রোগটির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ময়মনসিংহ, পাবনা এবং টাঙ্গাইল জেলায় (১)। কেবলমাত্র ময়মনসিংহেই ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে এ-রোগের বাৎসরিক গড় হার ছিলো প্রতি দশ হাজারে পাঁচ দশমিক আট জন এবং বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এলাকাগুলোতে এ-হার সর্বোচ্চ প্রতি দশ হাজারে ৩০০ জন (১,২)।

বাংলাদেশে কালাজ্বর পরবর্তী চর্মরোগজাতীয় রোগ বা পিকেডিএল-এর ডাক্তারী ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ১৯২২ সালে ব্রহ্মচারী নামক একজন গবেষকের কাছ থেকে (৩)। চামড়ায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষত, যেমন– হালকা রঙের ছোট ছোট দাগ থেকে শুরু করে লালচে দানা, গোটা ও অন্যান্য ক্ষত হিসেবে প্রথমে কোনো ব্যক্তির শরীরে এটি দেখা যায় এবং এছাড়া সাধারণত তার মধ্যে অন্য কোনো রোগের লক্ষণ দেখা যায় না। এগুলো সাধারণত কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর দৃশ্যত কার্যকর চিকিৎসার কয়েকমাস অথবা কয়েক বছর পর ওই ব্যক্তির শরীরে দেখা যায় (৪)। আক্রান্ত ব্যক্তিগণ যদিও ডাক্তারি পরীক্ষায় সুস্থ বলে মনে হয় তথাপি, তাদের চামড়ায় লেশমেনিয়া পরজীবী বেঁচে থাকে এবং বেলেমাছি এই রোগীর শরীর থেকে রক্ত পান করার পর সংক্রামিত হয়। এভাবেই পিকেডিএল-এর রোগীরা অ্যানথ্রোপোনোটিক লেশমেনিয়াসিস সংক্রমণের রিজার্ভার হিসেবে কাজ করে।

যদিও অনেক আগে থেকেই পিকেডিএল ডাক্তারি ভাষায় স্বীকৃত একটি রোগ, তথাপি এ-রোগের ঝুঁকির কারণগুলো, এর রোগতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ এবং রোগের ব্যবস্থাপত্রের ওপর গবেষণা খুবই সীমিত, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের কিছু এলাকায় যেখানে কালাজ্বর প্রায়ই লেগে থাকে, নিশ্চিতভাবেই পিকেডিএল রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। তবে সঠিক পরিসংখ্যান এখনো অসম্পূর্ণ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজ কেবল শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র রোগীর উপসর্গ দেখে পিকেডিএল রোগ সনাক্ত করা হয়, কারণ রোগীদের কাছ থেকে ডরমাটোপ্যাথোলোজিক্যাল নমুনা সংগ্রহ বাস্তবসম্মত নয় এবং আমাদের দেশে এ-রোগ নির্দিষ্টকরণে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদিন একটি করে ২০টি সোডিয়াম অ্যান্টিমোনি গ্লুকোনেট (এসএজি) ইনজেকশন দেওয়ার পর ১০ দিন বিরতি দিয়ে আবার প্রতিদিন একটি করে ২০ দিনে ২০টি এবং এভাবে ছয়মাসব্যাপী মোট ১২০টি ইনট্রামাসকুলার এসএজি ইনজেকশন দিয়ে পিকেডিএল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ময়মনসিংহ থেকে পিকেডিএল সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা

বর্তমানে কালাজ্বরে আক্রান্ত, পূর্বে কালাজ্বর ছিলো, চিকিৎসায় ব্যর্থতা বা পূর্বের রোগীদের পূনরায় এ-রোগে আক্রান্ত হওয়া, বর্তমানে পিকেডিএল-এ আক্রান্ত, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের রোগী সনাক্ত করা এবং তাদের সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানার জন্য বাংলাদেশে পিকেডিএল-এ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত উপজেলায় (ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া) একটি সার্ভিলেন্স কার্যক্রম এ-বছরের (২০০৭) জুন মাসে শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে সংগৃহীত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে যেসব এলাকায় রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি, মাঠকর্মীদের একটি দল সেসব এলাকা চিহ্নিত করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করছে। রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি, চিকিৎসককর্তৃক প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা এবং মাঠ পর্যায়ে আঙ্গুলের ডগা থেকে রক্ত নিয়ে (র‍্যাপিড, ফিঙ্গারপ্রিক ব্লাড বা সংক্ষেপে আরকে৩৯) পরীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান এবং বিগত পাঁচবছরের রোগীদেরকে সনাক্ত করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনটি গ্রামে সমীক্ষার মাধ্যমে ২০,০০০-এর অধিক উত্তরদাতার কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা হয়। সরকারি প্রতিবেদনে এ-রোগের হার কম দেখানো হয় কি না তা নির্ণয় করার জন্য এই গবেষণার সংগৃহীত উপাত্তের সাথে সরকারিভাবে সংগৃহীত প্যাসিভ পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে। অধিকন্তু, রোগীদের, বিশেষ করে বর্তমান রোগীদের ঝুঁকির কারণগুলো, ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রোগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণের কাজ বর্তমানে চলছে।

২০০৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ আনুমানিক ৮,৪০০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে চৌদার গ্রামে প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত করেছেন। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ৩২ জন পিকেডিএল রোগীকে সনাক্ত করা হয়েছে যাদের মধ্যে অতি-সম্প্রতি আক্রান্ত ১১ জন রোগী রয়েছে (গত পাঁচ বছরের মধ্যে যারা কালাজ্বরের চিকিৎসা নিয়ে আরোগ্য লাভ করেছে এবং চিকিৎসাকালীন সময়ে যে একজনের মৃত্যু হয়েছে)। উদ্ভুত এই কোহর্টের উপাত্তের ওপর প্রাথমিক পর্যালোচনা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। পুরো গ্রামে পিকেডিএল-এর হার যেখানে প্রতি হাজারে তিন দশমিক আটজন, সেখানে নদীপার নামক একটি পাড়ায় এ-হার ছিলো প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি হাজারে সাত দশমিক তিন জন (সারণি ১)। এছাড়া, এই এলাকায় চিকিৎসাপ্রাপ্ত কালাজ্বর রোগীদের মধ্যে পিকেডিএল-এর হার ছিলো ১৩.৯%, যা প্রত্যাশিত হার অপেক্ষা অনেক বেশি এবং নয়টি পাড়ার চারটিতেই তা ১৬% পর্যন্ত ছিলো (সারণি ২)।

সারণি ১: চৌদার গ্রামে পিকেডিএল-এর ঝুঁকি

চৌদার গ্রামের যেসব পাড়ায় সবচেয়ে বেশি রোগী ছিলো	মোট জনসংখ্যা	পিকেডিএল রোগী		
		পুরাতন রোগী*	বর্তমান রোগী	শতকরা হার (প্রতি ১,০০০ জনসংখ্যায়)
নদীপার	৮২১	০	৬	৭.৩
মধ্যপাড়া	২,৬২৫	১	১৩	৫.০
লক্ষ্মীপুর	১,২৩৪	৫**	৪	৩.২
ব্রাহ্মণবাড়ি	৫৭১	৪	৩	৫.৩
চৌদার গ্রামের মোট	৮,৩৯৭	১১	৩২	৩.৮

* গত পাঁচ বছরের মধ্যে আক্রান্ত, চিকিৎসাপ্রাপ্ত এবং ভাল হয়ে যাওয়া কিংবা চিকিৎসা চলাকালীন মৃত রোগী

** চিকিৎসা চলাকালীন যে রোগীটি মারা গিয়েছিলো তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

সারণি ২: গত পাঁচ বছরে চিকিৎসাপ্রাপ্ত কালাজ্বর রোগী এবং পরবর্তীতে যাদের মধ্যে পিকেডিএল রোগ দেখা দিয়েছে

চৌদার গ্রামের যেসব পাড়ায় সবচেয়ে বেশি রোগী ছিলো	কালাজ্বর রোগী		
	মোট রোগী*	যেসব রোগীর পিকেডিএল হয়েছিলো**	গত পাঁচ বছরে চিকিৎসা নেওয়া যেসব রোগীর মধ্যে পিকেডিএল রোগ দেখা দেয় তাদের শতকরা হার (%)
নদীপার	৩৫	৬	১৭.৬
মধ্যপাড়া	৭২	১৩	২০.০
লক্ষ্মীপুর	১৯	৩	১৭.৬
ব্রাহ্মণবাড়ি	৩৫	৬	২০.০
চৌদার গ্রামের মোট	২৩১	৩২	১৫.৩

*গত পাঁচ বছরে কালাজ্বরে আক্রান্ত মোট রোগী (বর্তমান আক্রান্ত রোগীসহ)

**পিকেডিএল রোগী যারা গত পাঁচ বছর পূর্বে কালাজ্বরে আক্রান্ত ছিলো তাদেরকে বিগত এবং বর্তমান পিকেডিএল রোগী হিসেবে সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে এই সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি

প্রত্যেকটি রোগীকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের কালাজ্বরের পর পিকেডিএল-এ আক্রান্ত হওয়ার সময় এবং চিকিৎসাসেবা নেওয়া-সংক্রান্ত বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের দেওয়া তারিখের ওপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে, কালাজ্বরের চিকিৎসা নেওয়ার দু'বছরের ভিতর অধিকাংশ (২৪/৪০) রোগীর মধ্যে পিকেডিএল-এর লক্ষণ ছিলো। এদের মধ্যে ২০% রোগী চিকিৎসা নেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে এবং ৪০% রোগী ছয় থেকে

২৪ মাসের মধ্যে পিকেডিএল-এ আক্রান্ত হয় (সারণি ৩)। এছাড়া, ১০ জন রোগী, চিকিৎসার পর যাদের মধ্যেকার পিকেডিএল-এর লক্ষণগুলো চলে যায় এবং যাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাদের সাতজন আসলে একটানা পর পর ২০টি বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ১২০টি এসএজি ইনজেকশনের পুরো চিকিৎসা সম্পন্ন করে নি।

সারণি ৩: কালাজ্বরের চিকিৎসার পরে পিকেডিএল-এর উপস্থিতি

কালাজ্বর চিকিৎসার পর পিকেডিএল-এর উপস্থিতি	রোগীর সংখ্যা (%)
০-৬ মাস	৮ (২০)
>৬-১২ মাস	৭ (১৮)
>১২-২৪ মাস	৯ (২২)
>২৪-৩৬ মাস	৯ (২২)
>৩৬-৪৮ মাস	৭ (১৮)

চিকিৎসা সম্পন্ন না করার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যাথা/ইনজেকশন সহ্য না হওয়া এবং এছাড়া অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ও পরিপূর্ণভাবে রোগের লক্ষণগুলো চলে যাওয়া অথবা এসএজি ইনজেকশন নেওয়ার সময়কালীন পার্শ্ববর্তী রোগীর মৃত্যু বা অন্য কোনো জটিল অসুস্থতা (সারণি ৪)।

সারণি ৪: চিকিৎসাপ্রাপ্ত এবং ভাল হয়ে যাওয়া পিকেডিএল রোগী

রোগী	লিঙ্গ	বয়স	মোট এসএজি ইনজেকশন	ওষুধের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়ার কারণ	চিকিৎসা শুরুর কতমাস পর ঘাঁ ভাল হয়ে যাওয়া শুরু	চিকিৎসা শুরুর কতমাস পর পিকেডিএল সেরে যায়
১	পুরুষ	১৫	৬০	এ	৮	১৫-১৬
২	পুরুষ	২৬	৬০	বি	৫	৭-৮
৩	পুরুষ	২৬	৬০	সি	৫	৭-৮
৪	মহিলা	২০	১২০		৩	৫
৫	মহিলা	১০	৮৬	ডি	অজানা	৫
৬	পুরুষ	৭	৬০	ই	২	৪
৭	মহিলা	৬	৬০	এফ	২	৯
৮	পুরুষ	৮	১২০		৩	৯
৯	মহিলা	১৭	১২০		১	৫
১০	পুরুষ	২৩	৯১	জি	৩	৯

এ = হাসপাতালে এসএজি নেওয়াকালীন পার্শ্ববর্তী রোগীর মৃত্যুর কারণে নিজেই ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেছে

বি = তিনটি এসএজি চক্র সম্পন্ন করার পর টাইফয়েডজনিত মারাত্মক অসুস্থতার কারণে ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেছে

সি = দু'নম্বর রোগীর ভাই, যে একই সময়ে ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেছে

ডি = ঘাঁ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে গেছে বলে চিকিৎসকই ওষুধ বন্ধ করেছেন

ই = এসএজি ইনজেকশনের তৃতীয় চক্র শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে তীব্র পেটে ব্যাথা, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর ও দুর্বলতার কারণে ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেছে

এফ = এসএজি ইনজেকশনের তৃতীয় চক্র শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে তীব্র ব্যাথা ও দুর্বলতার কারণে ওষুধ বন্ধ করেছে

জি = এসএজি ইনজেকশনের চতুর্থ মাসের সময়, দুর্বলতা ও খেতে না পারার কারণে ওষুধ বন্ধ করেছে

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই রোগীগুলো অন্য তিনজন রোগীর মতো, যারা পুরো ছয়মাসের কোর্স সম্পন্ন করেছিলো, মোটামুটি একই সময়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিলো, এবং চিকিৎসা শুরু করার তিন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে যাদের শরীরের ঘাঁ কমতে শুরু করেছিলো এবং চার থেকে নয় মাসের মধ্যে তা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছিলো।

এছাড়া কমবয়সী তিনজন রোগীর শরীরে পিকেডিএলজনিত ঘাঁসহ পুনরায় কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে। এদের মধ্যে একজনের রোগের বিবরণ বর্ণনা করা যেতে পারে: সাড়ে তিন বছর-বয়সী একটি মেয়ে, যার জন্মের সময় তার বাবা কালাজ্বরে আক্রান্ত ছিলো, ছয়মাস ধরে জ্বর এবং শরীরের বৃদ্ধি খুব কম হওয়ার ফলে ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথমেই ধরা পড়লো যে, সে কালাজ্বরে আক্রান্ত। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রেখে এক নাগাড়ে ২০ দিন ধরে এসএজি ইনজেকশন দেওয়া হলে তার অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু সাড়ে চার বছর বয়সে (এক বছর পর) পুনরায় সে দীর্ঘমেয়াদী জ্বর এবং ক্ষুধামান্দ্যে ভুগতে থাকে। এ-সময় সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ পুনরায় মনে করেন (প্রধানত রোগীর লক্ষণ ও শারীরিক পরীক্ষা এবং পজিটিভ আলডেহাইড (এটি) পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে) যে, মেয়েটির মধ্যে কালাজ্বরের জীবাণু রয়ে গেছে। তখন তাকে মাসে ২০টি করে তিন মাসে মোট ৬০টি এসএজি ইনজেকশনের একটি কোর্স দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মেয়াদের এই কোর্স সম্পন্ন করার প্রায় দু'মাস পর (আমাদের প্রাথমিক মূল্যায়নের ২১ মাস পূর্বে) তার দু'পায়ে খুব বেশি পরিমাণে হালকা রঙের দানা দেখা দেয়, সে পুনরায় পেটে ব্যাথা অনুভব করে এবং তার ক্ষুধা কমে যায়। মাঠ পর্যায়ে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রোগ-নির্ণয়ের সময় শিশুটিকে খুবই খাটো এবং খুব দুর্বল মনে হয়েছে, তার শরীরে হাইপোপিগমেন্টেড দানাগুলো স্পষ্টভাবে দেখা গেছে, বিশেষ করে গালের দু'পার্শ্বে, দু'বাহুতে এবং দু'পায়ে দানাগুলো ক্ষুদ্র থেকে বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তার পেট তখনও ফোলা ছিলো এবং প্লীহাটি ছিলো কিছুটা বড়। তার প্রায়ই জ্বর থাকতো, তাছাড়া, তীব্র ক্ষুধামান্দ্য এবং সাম্প্রতিক অসুস্থতার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তার শ্বাস কষ্ট ও চর্মরোগও ছিলো।

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ইউএসএ

মন্তব্য

ময়মনসিংহের পিকেডিএল রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আমাদের এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে বর্তমানে এ-রোগ সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তার ওপর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে এবং দেখা গেছে যে, বর্তমান ধারণার চেয়ে পিকেডিএল-এর হার অনেক বেশি এবং এর রোগ প্রক্রিয়া অনেক জটিল। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, দক্ষিণ-এশিয়ায় পিকেডিএল সীমিত আকারে সাধারণত সেসব কালাজ্বর রোগীদের মধ্যে দেখা যায়, যারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছে এবং যাদের মধ্যে চিকিৎসার পর কালাজ্বরের লক্ষণসমূহ আর ছিলো না। এই পিকেডিএল সাধারণত কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার দু-তিন বছর পর দেখা যায়, এবং এমনিতে এই রোগ কখনো ভাল হয় না বলে চিকিৎসা নেওয়া অপরিহার্য (৪)। কিন্তু ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ার জনগণের ওপর পরিচালিত গবেষণায় প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় যে, কালাজ্বর থেকে আরোগ্য লাভ করার দু'বছরের মধ্যে বেশিরভাগ রোগীর মধ্যে ডারমাল লেসন দেখা গেছে এবং কিছু রোগীর মধ্যে আরো তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে তা দেখা গেছে। আমরা আরো দেখেছি যে, কিছুসংখ্যক রোগীর পিকেডিএল লেসন খুব

তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোনো চিকিৎসা ছাড়াই সেগুলো একইভাবে আবার তাদের শরীর থেকে মিলিয়ে গেছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা করা যায় যে, পিকেডিএল চিকিৎসা ছাড়াও সেরে যেতে পারে। যেসব রোগীর ওপর এ-পর্যন্ত গবেষণা করা হয়েছে, তার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পিকেডিএল-এর স্বাভাবিক সংক্রমণ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি রোগীর ক্ষেত্রেই ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

অধিকন্তু, বেশ কিছু পিকেডিএল রোগী তখনো জ্বরে আক্রান্ত ছিলো বলে জানিয়েছে এবং কমপক্ষে আরো তিনজনের ক্ষুধামান্দ্য এবং আবারো পেট ফোলা ছিলো যা স্পষ্টত কালাজ্বরের লক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণগুলো থেকে বোঝা যায় যে, পিকেডিএল লেসন সব সময় কালাজ্বরের অন্যান্য লক্ষণগুলো থেকে আলাদা করা যায় না এবং সেসব রোগীর মধ্যেও এটি দেখা দিতে পারে যারা কারাজ্বরের চিকিৎসাসেবা সঠিকভাবে গ্রহণ করে নি। ফলে এসব রোগীর লক্ষণসমূহ একইভাবে বিদ্যমান থাকে, যাকে সচরাচর চিকিৎসার ব্যর্থতা বা রোগের পুনরাবির্ভাব হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে দক্ষিণ-এশিয়ায় প্রথম দিকে যা ধারণা করা হতো তার থেকে পিকেডিএল লেসন ক্লাসিক কালাজ্বরের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এটি সাধারণত আলাদা কোনো রোগ হিসেবে নয়, বরং লেশমেনিয়া জীবাণু বহনকারী বা রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত একটি পর্যায়ক্রমিক লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়, যে ধারণাটি সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা গিয়েছিলো সুদানের পিকেডিএল রোগীদের কাছ থেকে।

পর্যবেক্ষণের এই প্রাথমিক ফলাফল পিকেডিএল-এর বর্তমান চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং এ-রোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। ১২০টি এসএজি ইনজেকশনের মাধ্যমে বর্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতি শুধু দীর্ঘ এবং কষ্টদায়কই নয়, বরং ঝুঁকিপূর্ণও বটে। দীর্ঘদিন ধরে ওষুধের ব্যবহার মারাত্মক হৃদরোগের মতো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি এসএজি ব্যাচের কোনো বিষাক্ত ওষুধের ব্যবহারেরও ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এসব ওষুধ কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে বাজারে চলে আসে এবং এগুলোর ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু রোগীর হঠাৎ মৃত্যুবরণের মধ্যে দিয়ে এসব ওষুধের কথা জানা যায় (৫)।

আসলে ২০০৪ সালে চৌদার গ্রামে মোটামুটি সুস্থ থাকা সাত বছর-বয়সী একটি বালিকা তার পিকেডিএল চিকিৎসা চলাকালীণ সময়ে ৫৭টি এসএজি ইনজেকশন নেওয়ার পরেও হঠাৎ মারা যাওয়ার ফলে (নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিবারের কিছু সদস্যের কাছ থেকে যা জানা গেছে) ওষুধের বিষক্রিয়া সম্পর্কে একটি বড় ধরনের উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, এ-ধরনের কঠিন চিকিৎসা-ব্যবস্থা ব্যাপক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বা যেসব দেশে কালাজ্বর লেগে আছে সেসব দেশেও কার্যত সমর্থন করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বিহার রাজ্যে, যেখানে কালাজ্বরের অ্যান্টিমোনি-প্রতিরোধ একটি বড় সমস্যা, সেখানে তিনমাসের অধিক সময় ধরে এসএজি খুব কমই ব্যবহার করা হয়, এবং পূর্ব-আফ্রিকায় পিকেডিএল-এর চিকিৎসা করা হয় সাধারণত কিছু ওষুধের সংমিশ্রণে তৈরি স্বল্পকালীন কোর্স দিয়ে, যার মধ্যে অধিকতর কার্যকর বিকল্প হিসেবে অ্যাম্পোটারিসিন অথবা প্যারোমোমাইসিন দেওয়া হয়ে থাকে। সাতজন রোগী, যারা মান-সম্পন্ন চিকিৎসা থেকেও কম চিকিৎসা নিয়ে আরোগ্য লাভ করেছে, তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এই পরামর্শ দিতে পারি যে, এসএজি-এর মাধ্যমে ছয় মাসের এই কঠিন কোর্স আরোগ্যলাভের জন্য সবসময় প্রয়োজন নাও হতে পারে।

এছাড়াও, চৌদার গ্রাম থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, কালাজ্বরের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে পিকেডিএল-এ আক্রান্তের হার অনেক বেশি হতে পারে এবং এটির বিস্তারও

থাকতে পারে ধারণাতীতভাবে বেশি। যদিও পুরো গ্রামে এর বিস্তার (৩.৮/১,০০০) ভারতের অন্তর্গত বারানসির একটি এনডেমিক এলাকা থেকে কম (৪.৮/১,০০০) (সেখানকার একমাত্র কমিউনিটিভিত্তিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, যা ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে), তথাপি চৌদার গ্রামের তিন নম্বর পাড়ায় আক্রান্তের হার বারানসি থেকে বেশি (৫.০/১,০০০) (৫)। একইভাবে আমাদের এখানে পিকেডিএল-এর উদ্ভব হয়েছে যেসব কালাজ্বর রোগীর মধ্যে তাদের কোহর্টের অনুপাত অনেক বেশি, যা পুরো কমিউনিটিতে ১৪% এবং সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দুটো পাড়ায় ১৮%। এ-হার সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ৫-১০% এর যে হার বিরাজমান থাকে তার থেকে অনেক বেশি। কালাজ্বরের চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে পিকেডিএল-এর হার সম্পর্কে আমাদের বর্তমান হিসাব সঠিক হিসাব থেকে সম্ভবত কম। কারণ, গত পাঁচ বছরের কালাজ্বর রোগীদের মধ্য থেকে যাদেরকে সনাক্ত করা হয়েছে, বিশেষ করে যারা অতি সম্প্রতি অসুস্থ ছিলো, তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যতে যেকোনো সময় ডারমাল লেসন দেখা দিতে পারে।

অল্পসংখ্যক নমুনার ওপর করা যেকোনো চলতি গবেষণার প্রাথমিক মূল্যায়নে ভুল বা অতি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে বলে তা সমালোচিত হতে পারে এবং পরিপূর্ণ উপাত্তের বিশ্লেষণ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণকে সমর্থন নাও করতে পারে। এছাড়া, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে প্রাপ্ত রোগের হার এবং রোগীর বৈশিষ্ট্য দেশের কম-আক্রান্ত এলাকা বা অন্য কোনো এলাকার সাথে নাও মিলতে পারে।

এতদসত্ত্বেও, ময়মনসিংহ থেকে পাওয়া কমিউনিটিভিত্তিক এই উপাত্ত পিকেডিএল-এর ওপর আরো গবেষণার সুপারিশই শুধু করে না, বরং বর্তমানে চালু জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ পুনর্মূল্যায়নেরও দাবী করে। সাধারণত কালাজ্বরের রোগীরা পিকেডিএল-এ আক্রান্ত হয়েছে কি না তা লক্ষ্য রাখার জন্য তাদেরকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এর সাথে কমিউনিটিভিত্তিক রোগী-সনাক্তকরণের পরিসরও বাড়ানো উচিত। একইভাবে, পিকেডিএল-এর রোগতাত্ত্বিক এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করা হবে একটি উত্তম ব্যবস্থা, যার মধ্যে (ক্রস-সেকশনাল বা বিগত হয়ে যাওয়া বিশ্লেষণ অপেক্ষা) দীর্ঘদিনব্যাপী নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। পরিশেষে, রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলির মধ্যে আগে ভাগে এবং সরাসরি (অ্যাকটিভ) রোগী সনাক্তকরণের সাথে কালাজ্বর এবং পিকেডিএল-এর বিকল্প চিকিৎসা-কৌশল এবং এ-সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থাবলি যেমন, ভেক্টর কন্ট্রোলজাতীয় কৌশলও তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করা উচিত, বিশেষ করে সেসব এলাকার জন্য যেসব এলাকায় রোগীর হার অনেক বেশি।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার সাথে বাল্য-বিয়ের সম্পর্ক

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ১৮ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিয়ে একটি সাধারণ ঘটনা। এ–গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার সাথে বাল্য-বিয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করা। অভয়নগরে আইসিডিডিআর,বি-কর্তৃক পরিচালিত চলতি সার্ভিলেন্স থেকে এ-গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য নমুনা হিসেবে যেসব মেয়েদেরকে বাছাই করা হয়, তাদের মধ্যে ১৮ বছরের পূর্বে যেসব মেয়ের বিয়ে হয়েছে তারা কেউই ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশি দিন ধরে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। অথচ ২৩% মেয়ে যারা ২৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সে বিয়ে করেছে তারা ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশি দিন ধরে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। যেসব মেয়ে ১৯ বছরের কম বয়সে বিয়ে করেছে তাদেরকে বাড়ির বাইরে শ্রমের সাথে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে কম। এই উপাত্তসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, দেরিতে মেয়েদের বিয়ে হলে তাদের শিক্ষা-জীবন বৃদ্ধি পেতে পারে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে উচ্চহারে বাল্য-বিয়ের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ একটি (১)। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় দিক থেকে সুবিধার আশায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাবা-মা তাঁদের মেয়েদের বাল্যকালে বা শিশুকালেই বিয়ে দিতে উৎসাহ বোধ করেন। যুবতী মেয়েরা সাধারণত তাদের পরিবারের কাছে একটি আর্থিক বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। তাই দেখা যায়, তাদেরকে খুব অল্প-বয়সে বিয়ে দিয়ে পরিবার আর্থিক ভারমুক্ত হতে চায় (২)। মেয়ের বয়স বেড়ে গেলে তার জন্য যৌতুকের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার আশংকায় বাবা-মা অল্প-বয়সে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে চান (৩)। এছাড়া বাবা-মা মনে করেন যে, অবিবাহিত থাকার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দিলে তাঁদের মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, তার আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল থাকবে এবং যৌন-হয়রানি বা অবৈধ যৌন-সংগমের হাত থেকে নিরাপদে থাকবে। অবিবাহিত বয়স্ক মেয়েদের পরিবারকে সাধারণত কলংকিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ তাঁরা তাঁদের মেয়েকে কম-বয়সে বিয়ে দিয়ে তাঁদের পরিবারের সম্মান রক্ষা করতে পারেন নি।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাল্যকালে যেসব মেয়ের বিয়ে হয়েছে তারা তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তাদের স্বামীদের সামাজিক অবস্থান নিচের দিকে, সন্তান উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণ কম এবং তাদের মধ্যে মাতৃমৃত্যু এবং পারিবারিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার হার খুব বেশি (৩)। বাল্য-বিয়েতে একজন নারীর প্রজননক্ষম সময় বেড়ে যায়, ফলে পরিবারের আকারও বেড়ে যায়, বিশেষ করে জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ না করার ফলে। অধিকন্তু, ব্যক্তি পর্যায়ের এই অবস্থা সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে, যেমন– জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়, মাতৃমৃত্যুর হার বেড়ে যায় এবং অধিকহারে শিশুরা এতিম হয়ে যায় (৪)। এমতাবস্থায়, নীতিনির্ধারক এবং মানবাধিকারের প্রবক্তাদের কাছে বাল্য-বিয়ে একটি বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উন্নয়নশীল দেশের সমাজ-সংস্কারকেরা বাল্য-বিয়ের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (৪)। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার-সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে প্রণীত এ-সংক্রান্ত আরো অনেক নীতিমালায় বিয়ে করার স্বাধীন মতামতের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সম্মতি-সংক্রান্ত আইনে বয়স নির্ধারণের পক্ষে যারা কথা বলেন, তাঁরা এই বলে

যুক্তি দেখান যে, মেয়েদের দেরি করে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের বাবা-মাকে বাধ্য করতে পারলে মেয়েদের শিক্ষা-জীবন বৃদ্ধি পাবে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের হারও বেড়ে যাবে, এবং সেই সাথে পারিবারিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার হারও কমে যাবে। অতি-সম্প্রতি নিরাপদ মাতৃত্বের পক্ষের প্রবক্তারা যে বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, তা হলো – অল্প-বয়সে বিয়ে করার ফলে গর্ভবতী হলে তা মা ও শিশু উভয়ের বেঁচে থাকা এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় (৪)।

উক্ত প্রেক্ষাপটে, এ-গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার সাথে বাল্য-বিয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত অভয়নগর উপজেলায় পাঁচটি ইউনিয়ন নিয়ে ১৯৮২ সাল থেকে পরিচালিত আইসিডিডিআর,বির সার্ভিলেন্স এলাকা থেকে আলোচ্য গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ-সার্ভিলেন্সের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো, সময়ের পরিবর্তনের সাথে জনসংখ্যার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা। প্রতি তিনমাস পর পর প্রত্যেক চতুর্থ বাড়িতে গিয়ে নির্ধারিত প্রশ্নমালার সাহায্যে উক্ত বাড়ির সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের মধ্যেকার জন্ম, মৃত্যু, অভিবাসন, জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি, টিকা, বিয়ে, পেশা এবং শিক্ষাসম্পর্কিত উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা হয়। সার্ভিলেন্সের আওতায় ৭,৫০০ বাড়ির ৩৪,০০০ মানুষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০০৫ এবং ২০০৬ সালে অভয়নগর সার্ভিলেন্স এলকায় যেসব মেয়েদের বিয়ে হয়েছে তাদের সবাইকে এ-গবেষণার নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি ১: ২০০৫-২০০৬ সালে অভয়নগরে যেসব মেয়ে বিয়ে করেছে তাদের সামাজিক-জনমিতিক বৈশিষ্ট্য

	মেয়েদের সংখ্যা=৫৬৪ সংখ্যা (%)
শিক্ষা	
০-৫ বছর	১৫০ (২৭)
৬-১০ বছর	৩৮৯ (৬৯)
১১ বছর এবং তার বেশি	২৫ (৪)
বিয়ের সময় বয়স	
৮-১৫ বছর	৯৯ (১৭)
১৬-১৮ বছর	২২০ (৩৯)
১৯-২৪ বছর	২০২ (৩৬)
২৫ বছর বা তার বেশি	৪৩ (৮)
বাড়ির বাইরে শ্রমে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাত্রী	১৫২ (২৭)
উত্তরদাত্রীর মায়ের শিক্ষা	
লেখাপড়া করে নি	৩৫৩ (৬৩)
প্রাথমিক শিক্ষা	২১১ (৩৭)
উত্তরদাত্রীর বাবার শিক্ষা	
০-৫ বছর	২২২ (৩৯)
৬-১০ বছর	৯১ (১৬)
১১ বছর বা তার বেশি	১১০ (২০)
জানা যায় নি	১৪১ (২৫)
বাড়ির বাইরে শ্রমে অংশগ্রহণকারী মা	৮২ (১৫)
কৃষিজীবী বাবা	৩২২ (৫৭)

উত্তরদাতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

২০০৫ এবং ২০০৬ সালে অভয়নগর সার্ভিলেন্স এলাকায় বিবাহিত ৫৬৪ জন মেয়ের কেউই উচ্চশিক্ষিত ছিলো না (সারণি ১)। দুই-তৃতীয়াংশ (৬৯%) মেয়ের শিক্ষা-জীবন ছিলো ৬-১০ বছরের মধ্যে। এক-চতুর্থাংশের মতো (২৭%) মেয়ের শিক্ষা ছিলো পাঁচ বছর পর্যন্ত। শতকরা মাত্র চারভাগ মেয়ের শিক্ষা-জীবন ছিলো ১১ বছরের অধিক।

২০০৫ এবং ২০০৬ সালে যত মেয়ের বিয়ে হয়েছে তাদের ১৭%-এর বয়স

ছিলো ১৬ বছরের কম এবং তাদের মধ্যে আট বছরের একটি শিশুও ছিলো। বিবাহিত মেয়েদের মধ্যমা (মেডিয়ান) বয়স ছিলো ১৮ বছর এবং তাদের মাত্র শতকরা আটভাগের বয়স ছিলো ২৫ বছর বা তার থেকে বেশি (চিত্র ১)।

চিত্র ১: ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে অভয়নগরে যেসব বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়েছে

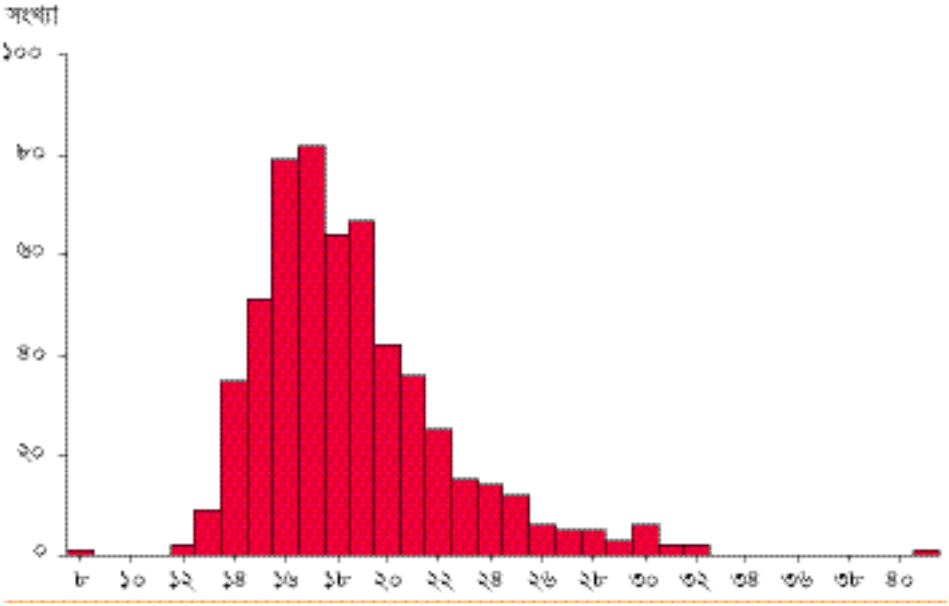

বিবাহিত মেয়েদের বেশিরভাগই কোনো শ্রমের সাথে যুক্ত হয় নি (সারণি ১)। এসব মেয়ের ৬০%-এরও বেশির মায়েদের কোনো শিক্ষা ছিলো না। কোনো মায়েরই ১১ বছর বা তার থেকে বেশি দিনের শিক্ষা-জীবন ছিলো না। অতএব মায়েদেরকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা– শিক্ষাহীন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ৩৯% বাবার পাঁচ বছর বা তার থেকে কম সময়ের শিক্ষা ছিলো। ২৫% বাবার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো (সারণি ১-এ অজানা হিসেবে দেখানো হয়েছে)। অর্ধেকেরও বেশি বাবা কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, অথচ বেশিরভাগ মায়েরাই বাড়ির বাইরে কোনো শ্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন না।

বাল্য-বিয়ে এবং শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক

বাল্যকালে যেসব মেয়ে বিয়ে করেছে তারা অপেক্ষাকৃত কম সময় ধরে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া করেছে (সারণি ২)। যেসব মেয়ে ১৯ বছর বয়সের পূর্বে বিয়ে করেছে তাদের কেউই ১১ বছর বা তার থেকে বেশি দিন ধরে লেখাপড়া করে নি। অন্যদিকে যে ২৩% মেয়ে ২৫ বছরে বা তার থেকে বেশি বয়সে বিয়ে করেছে তারা কমপক্ষে ১১ বছর ধরে লেখাপড়া করেছে। যে ৭% মেয়ে ১৯ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে বিয়ে করেছে তারা কমপক্ষে ১১ বছর ধরে শিক্ষালাভ করেছে। মাত্র ১৪% মেয়ে যারা ২৫ বছর বা তার থেকে বেশি-বয়সে বিয়ে করেছে তাদের তুলনায় ৩৯% মেয়ে যারা

১৬ বছর বয়সের পূর্বে বিয়ে করেছে, তারা ছয় বছরেরও কম সময় লেখাপড়া করেছে।

শিক্ষার ওপর বিয়ের বয়সের যে প্রভাব তার সাথে বাবা-মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত বিষয়টি সম্পৃক্ত কি না, লজিস্টিক রিগ্রেশনের মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের মধ্যমা স্কুল-জীবন ছিলো আট বছর। আট বছরের কম সময় ধরে শিক্ষা গ্রহণের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো লজিস্টিক রিগ্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স একটি শক্তিশালী মাধ্যম, এমনকি বাবা-মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রেখেও দেখা গেছে যে, শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স একটি যুক্তিগ্রাহ্য এবং স্বাধীন মাধ্যম, অর্থাৎ বিয়ের বয়সের কথা শুনে শিক্ষাগত যোগ্যতা সহজেই অনুমান করা যায় (সারণি ৩)। যেসব মেয়েরা ১৫ বছরের কম বয়সে বিয়ে করেছে তাদের শিক্ষা-জীবন আট বছর বা তার থেকে কম হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

শুধু শিক্ষা নয়, বরং শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়টিও মেয়েদের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি প্রধান হাতিয়ার (৩)। এ-বিষয়টি মাথায় রেখে মেয়েদের বাল্য-বিয়ের সাথে তাদের শ্রমের সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাদের বাল্য-বিয়ে হয়েছে, শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের মধ্যে ৮-১৫ এবং ১৬-১৮ বছর বয়সে যাদের বিয়ে

সারণি ২: অভয়নগরে ২০০৫-২০০৬ সালে মেয়েদের বিয়ের বয়সের সাথে তাদের লেখা-পড়ার সম্পর্ক

বিয়ের সময় বয়স	শিক্ষা (বছর) ০-৫ বছর	৬-১০ বছর	≥১১ বছর
৮-১৫ বছর (সংখ্যা=৯৯)	৩৯%	৬১%	০%
১৬-১৮ বছর (সংখ্যা=২২০)	২৯%	৭১%	০%
১৯-২৪ বছর (সংখ্যা=২০২)	২০%	৭৩%	৭%
≥২৫ বছর (সংখ্যা=৪৩)	১৪%	৬৩%	২৩%
সর্বমোট (সংখ্যা=৫৬৪)	২৭%	৬৯%	৪%

সারণি ৩: ২০০৫-২০০৬ সালে অভয়নগরে মহিলাদের শিক্ষা লাভের লজিস্টিক রিগ্রেশন অডস

	আট বছর বা তার থেকে কম শিক্ষালাভের ঝুঁকি অ্যাডজাস্টেড অডস রেশিও (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল)
বিয়ের সময় বয়স	
৮-১৫ বছর	২৮.০ (৯.৮-৮০)
১৬-১৮ বছর	৪.৬ (২.১-১০)
১৯-২৪ বছর	১.৩ (০.৫৯-২.৯)
২৫ বছর বা তার বেশি*	০.০
শ্রমে অংশগ্রহণ	
শ্রমে অংশগ্রহণ করে নি	২.৬ (১.৬-৪.১)
শ্রমে অংশগ্রহণ করেছে*	০.০
মায়েদের শিক্ষা	
লেখাপড়া করে নি	৩.৩ (২.১-৫.১)
প্রাথমিক শিক্ষা*	০.০
বাবার শিক্ষা	
০-৫ বছর	২.৪ (১.৫-৩.৭)
৫ বছরের বেশি*	০.০

*কম্পারিজন গ্রুপ

হয়েছে, তাদের ২৫%-২৬% শ্রমের সাথে যুক্ত ছিলো, অথচ তাদের তুলনায় ২৫ বছর বা তার থেকে বেশি-বয়সে যারা বিয়ে করেছে, তাদের এ-হার ছিলো ৪৭% (সারণি ৪)।

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বি

সারণি ৪: ২০০৫-২০০৬ সালে অভয়নগরে বাল্য-বিয়ে এবং শ্রমে অংশগ্রহণের মধ্যে সম্পর্ক

বিয়ের সময় বয়স	শ্রমে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা (%)
৮-১৫ (সংখ্যা=৯৯)	২৫ (২৫)
১৬-১৮ (সংখ্যা=২২০)	৫৭ (২৬)
১৯-২৪ (সংখ্যা=২০২)	৫০ (২৫)
≥২৫ বছর (সংখ্যা=৪২)	২০ (৪৭)
সর্বমোট (সংখ্যা=৫৬৪)	১৫২ (২৭)

মন্তব্য

বাংলাদেশের এই গ্রামাঞ্চলে বিবাহিত মেয়েদের ১৭%-এর বয়স ১৬ বছরের নিচে। গত দশকে 'সবার জন্য শিক্ষা' নামক শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে আরো অধিক মেয়েদেরকে স্কুলে ভর্তি এবং লেখাপড়া শেষ করার পূর্বে তাদেরকে ঝরে পড়া থেকে বিরত রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। এ-প্রেক্ষিতে মেয়েদের বাল্য-বিয়ে শিক্ষা থেকে তাদের ঝরে পড়ার একটি কারণ হিসেবে স্বীকৃত, বিশেষ করে সেসব সমাজে যেখানে মেয়েরা সারাজীবন গৃহস্থালীর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং খুব অল্প বয়সে তাদেরকে বিয়ে করতে হয় (৫)। আলোচ্য গবেষণা থেকে আরো জানা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেসব মেয়ের খুব অল্পবয়সে বিয়ে হয়, তারা খুব কম শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বিয়ের পরে মেয়েরা লেখা-পড়া চালিয়ে শেষ পর্যন্ত কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে সে-বিষয়টি যদিও এ-গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করা হয় নি, তবে অন্যান্য গবেষণা থেকে জানা যায় যে, গ্রাম-বাংলার মেয়েরা বিয়ের পরে আর লেখাপড়া করে না (৬)। বিবাহিত মেয়েরা তাদের বিয়ের পূর্বে কখনো স্কুলে পড়তো কি না সে বিষয়টিও আমরা জানতে পারি নি। তবে এ-গবেষণা 'দেরিতে মেয়েদের বিয়ে তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটায়'-সংক্রান্ত ধারণাকে সমর্থন করে।

বাল্য-বিয়ে নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর। বাংলাদেশে এ-আইনের আংশিক বাস্তবায়নও যদি সম্ভব হয়, তাহলে তা মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বাংলাদেশে আইন অমান্যকারী, সে পিতা-মাতা বা স্বামী যেই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে খুব বেশি দেখা যায় না। সম্মতি-আইনে বয়সের প্রয়োগ একটি কঠিন বিষয়, কারণ, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ বিয়েই অনিবন্ধিত (৬)। এ-অবস্থার জন্য আরও একটি বিষয় দায়ী, তা হলো – অনিবন্ধিত জন্ম তারিখ – এটি এতই অনিয়মিত যে বিয়ের সময় একজনের বয়স কত হলো তা জানা নাও যেতে পারে। বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করার জন্য আইন প্রয়োগ করা উচিত। তবে এ-ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আইনের ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। বাল্যবিয়ে ঠেকানোর জন্য সামাজিক কর্মসূচিও কার্যকর হতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাল্য-বিয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্রতা। সুতরাং দারিদ্র্য দূরীকরণার্থে নেওয়া কর্মসূচিতে যেসব পরিবার তাদের মেয়েদেরকে বাল্যবিয়ে দিবে, তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টিও থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারতে একটি ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পে সেসব বাবা-মাকে তাদের প্রকল্পের আওতা-বহির্ভূত রাখা হয়, যাঁরা ১৯ বছর বয়সের পূর্বে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দেন (৬)। এ-ধরনের সৃষ্টিশীল কলাকৌশল বাংলাদেশেও

কার্যকর হতে পারে। সম্ভাব্য সবধরনের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যাতে মেয়েরা বিয়ে করার মতো অবস্থায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সর্ম্পকে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: ডিসেম্বর ২০০৬-নভেম্বর ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা = ১৭৯)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা = ৭২১)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২২.০	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৪.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৭.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৩.৫	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৬.৬	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৪৮.৮
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০.৫
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: ডিসেম্বর ২০০৬-নভেম্বর ২০০৭

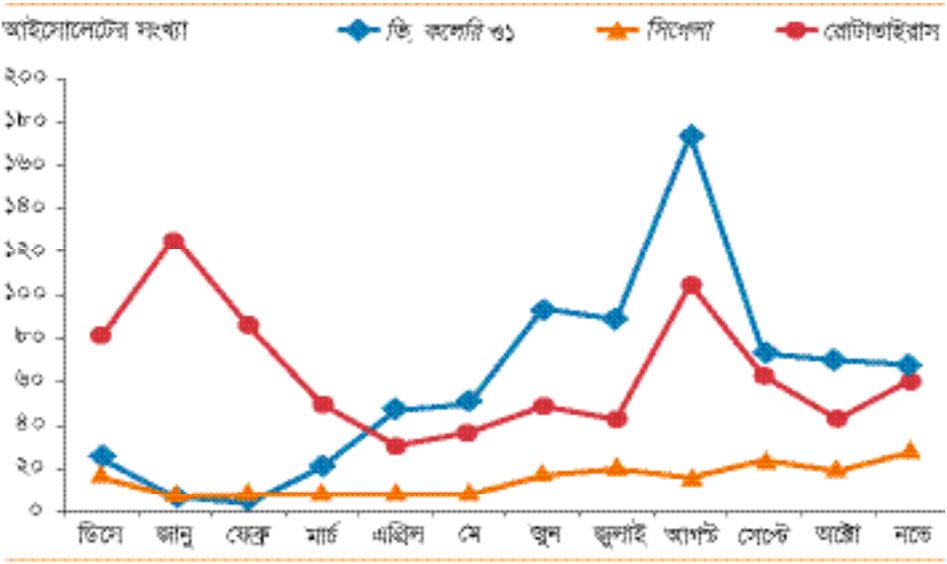

ওষুধের বিরুদ্ধে ১১৪টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: ডিসেম্বর ২০০৬-জুলাই ২০০৭

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারি (সংখ্যা=১০৬)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=৮)	মোট (সংখ্যা=১১৪)
স্ট্রেপটোমাইসিন	২৫ (২৩.৬)	২ (২৫.০)	২৭ (২৩.৭)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৮ (৭.৫)	২ (২৫.০)	১০ (৮.৮)
ইথামবিউটাল	২ (১.৯)	২ (২৫.০)	৪ (৩.৫)
রিফামপিসিন	৩ (২.৮)	২ (২৫.০)	৫ (৪.৪)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	২ (১.৯)	২ (২৫.০)	৪ (৩.৫)
অন্যান্য ওষুধ	২৬ (২৪.৫)	২ (২৫.০)	২৮ (২৪.৬)

() শতকরা হার * একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা* সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা* সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১১	২ (১৮.০)	০ (০.০)	৯ (৮২.০)
ক্লোরামফেনিকল	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১১	১০ (৯১.০)	১ (৯.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	১১	০ (০.০)	০ (০.০)	১১ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর (শহরাঞ্চল) এবং টাঙ্গাইলের মির্জাপুর (গ্রামীণ) এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৭৯	৩৯ (৪৯.০)	০ (০.০)	৪০ (৫১.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৭৯	৪৩ (৫৪.০)	০ (০.০)	৩৬ (৪৬.০)
ক্লোরামফেনিকল	৭৯	৪২ (৫৩.০)	০ (০.০)	৩৭ (৪৭.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৭৯	৭৯ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭৯	৫২ (৬৬.০)	২৬ (৩৩.০)	১ (১.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর।

ময়মনসিংহের একটি তরুণ পিকেডিএল রোগীর মুখমণ্ডলে হাইপোপিগমেন্টেড দানা ও দাগ দেখা যাচ্ছে

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি লুবি
পিটার থর্প
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

সম্পাদনা বোর্ড:
চার্লস পি লারসন
এমিলি এস গারলি

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
নুসরাত হোমায়রা
শামীম ইসলাম
রুমানা এ. সাইফী

অতিথি সম্পাদক:
শামীমা আক্তার

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাংলা অনুবাদ:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম